মাইলেন কনস্তান্তিনোভস্কি
'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মাইলেন কনস্তান্তিনোভস্কি

ছবি এ'কেছেন আন্দ্রেই প্লাতোনভ

অনুবাদ: বিপ্লব মাজী

সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

'রাদ্‌গা' প্রকাশন
মস্কো

আদরের ছোটোরা!

তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার চারপাশের এই যে জল, মাটি, বাতাস, ঘরবাড়ি, গাছপালা, জীবজন্তু আর মানুষ — তারা কোথা থেকে এলো? তুমি কি বলবে? আমার মনে হয়, তুমি বলবে: ‘এই বিশ্বের সবই তৈরি হয়েছে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র কণা — পরমাণু

থেকে।' তোমার কথা ঠিকই কিন্তু তা আংশিকভাবে সত্যি। একটু পরেই তুমি বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি।

ধরো, তুমি যদি আমাকে একই ধরনের একটা প্রশ্ন দিতে: 'এ বইটার পাঠ কিভাবে গড়ে উঠেছে?' আমি বলতাম: 'বর্ণমালা সাজিয়ে!' উত্তরটা আমার ঠিকই কিন্তু তাও আংশিকভাবে। এবার তুমি নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তরটা সম্পূর্ণ করে বলবে: 'বই-এর পাঠ তৈরি হয় শব্দ থেকে আর শব্দ তৈরি হয় বর্ণ থেকে।'

সত্যি, বর্ণের সঙ্গে বর্ণ জুড়ে যদি না শব্দ তৈরি হত, একটা সাধারণ বইও আমরা লিখে উঠতে পারতাম না। আমাদের বর্ণমালায় চল্লিশের কিছু বেশি বর্ণ আছে। এ নিয়ে কি অনেক কথা বলা যায়? ওদিকে দেখ শব্দ — যা একই বর্ণমালা থেকে তৈরি — তা দিয়ে কত হাজার হাজার নানান ঘটনার কথা বলা হয়ে থাকে, কত হাজার হাজার বই লেখা হয়, পড়ার বই, গান, স্কুলের রচনা, চিঠিপত্র — যা পড়ে শেষ করে ফেলা কখনো সম্ভব না।

যে কোন ভাষার বর্ণমালার চেয়ে নানা রকমের পরমাণুর সংখ্যা বেশি। তবে তা এমন কিছু বেশি না। যখন এই বইটা লিখছি তখন পর্যন্ত পরমাণুর পর্যায় সারণীতে আমরা মোট একশ সাতটি পরমাণুর দেখা পাচ্ছি। যদিও এদের সবাইকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না — কয়েকটিকে পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে পাওয়া গেছে। পরমাণুগুলি যদি নানান জোটে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে না পারত, তাহলে সব মিলিয়ে এই বিশ্বে আমরা হয়ত বা মাত্র একশটির মত পদার্থের দেখা পেতাম। নানা ধরনের জিনিসের অভাবে পৃথিবী হয়ে উঠত একঘেয়ে, বিরক্তিকর; যেমন এ বই-এর প্রথম পাতায় শুধু যদি একটি অক্ষর থাকত, দ্বিতীয় পাতায় অন্য একটি, তৃতীয় পাতায় আরেকটি — এইভাবে প্রতি পাতায় মাত্র একটি করে অক্ষর...

তুমি বেশ ভালোই জানো পৃথিবী ওরকম না। ঘর থেকে না বেরিয়েও তুমি নিজের চারপাশে কত হাজার রকমের জিনিস দেখতে পাও। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা মিলিয়ে এখন আমরা নানা ধরনের কয়েক লক্ষ বস্তুর কথা জানি। প্রতিদিন এই সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে কারণ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন নতুন জিনিস তৈরির ব্যাপারে পরমাণুরা বর্ণের চেয়ে কম যায় না।
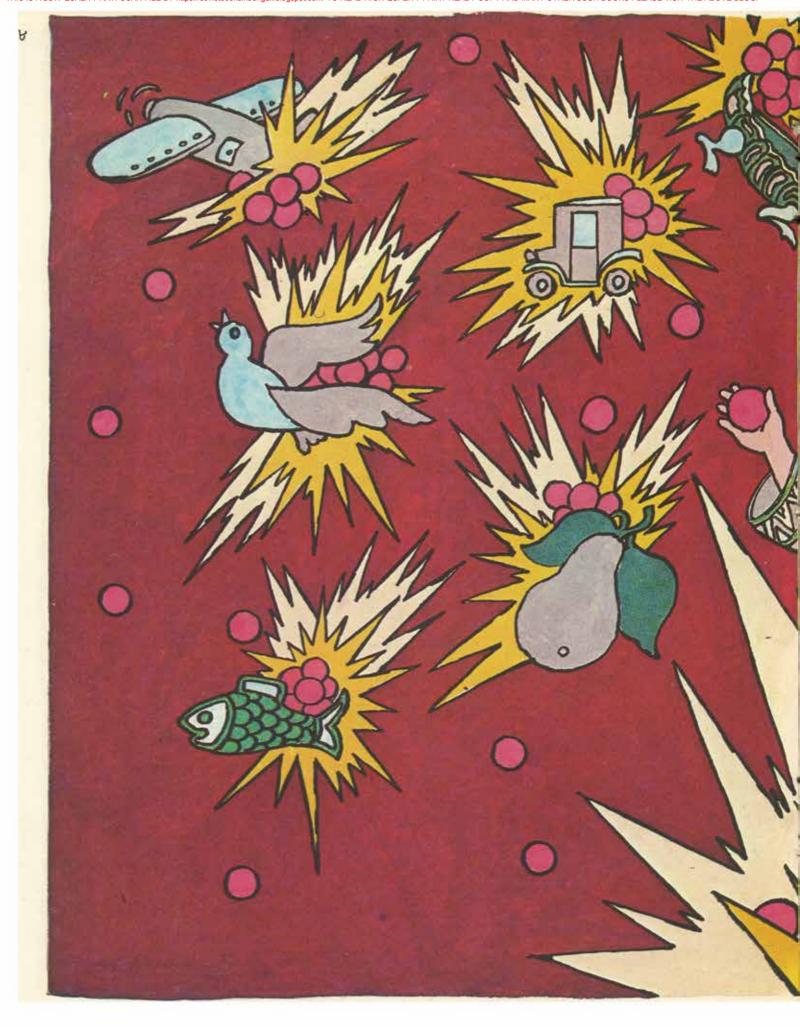
একই ধরনের পরমাণু কীভাবে মিলিত হয়

তোমার কি কখনো এমন শব্দ চোখে পড়েছে যা একরকম বর্ণ থেকে তৈরি? এরকম কোন শব্দের কথা আমার জানা নেই। আ-আ, উ-উ-উ, র-র-র-র, এ-এ... এমনি আরো একই বর্ণের সঙ্গে একই বর্ণ যোগ করে যে শব্দ তৈরি হয়, শব্দ হিশেবে তার কি কোন নাম দেওয়া যেতে পারে? হতে পারে তা মাত্র অনুকারক ধ্বনি।

তাহলে, পরমাণুরা কীভাবে মিলিত হয়?

উদাহরণ হিশেবে তোমার জানা পদার্থ আইডিনের কথা ধরা থাক। আইডিন ধূসর-বাদামি রঙের তরল পদার্থ। কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে যা আমরা গায়ে লাগাই। এটা বিশুদ্ধ আইডিন নয়, স্পিরিটে আইডিনের দ্রবণ, আইডিনের ক্বাথ। ওষুধের দোকানে গেলে তুমি বিশুদ্ধ আইডিন দেখতে পাবে। দেখতে ভারি সুন্দর, কালো-বাদামি রঙের — কিছুটা বেগুনি ছটার স্ফটিক। এই কেলাসিত আইডিন — আইডিনের পরমাণু ছাড়া অন্য কিছু না। অন্য কোন পরমাণু ওখানে নেই। তবুও, তোমাকে ওরকম কোন কেলাসিত পদার্থ দেখিয়ে যদি জিগ্যেস করা হয়: 'বল তো এই বস্তুটির সবচেয়ে ক্ষুদ্রকণাটি কী?' দ্রুত উত্তর দিয়ে বসো না: 'আইডিনের পরমাণু — তাছাড়া আর কিই বা হতে পারে?!' কারণ আইডিনের পরমাণু তার কেলাসের মধ্যে দুটি করে জোড় বেঁধে 'বসে' থাকে (আইডিনের পরমাণু আলাদা আলাদা হয়ে যায় না); এমনকি আইডিনের কেলাস যখন গলে যায় বা বাষ্পীভূত হয়।

আমরা যদি আইডিনের পরমাণুর জোড় ভেঙে দিই — তাহলে আইডিনের একটি পরমাণু থেকে কি অন্যধরনের কোন পদার্থ পেতে পারি?

পরমাণু যেহেতু একই, মনে হতে পারে, এর মধ্যে আর কিই বা এমন কিছু পার্থক্য ঘটবে? কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ অন্য গুণসম্পন্ন পদার্থ আমরা পাচ্ছি। তার মানে দেখা গেল যে, একটি পরমাণু ও ঠিক একই গুণসম্পন্ন দুটি মিলিত পরমাণু ঠিক একই পদার্থ নয়।
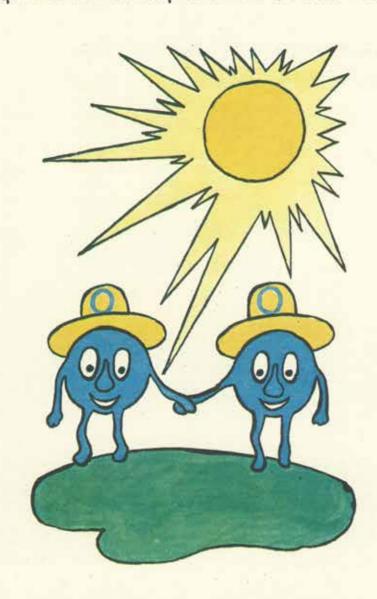
এখন তুমি জানলে কীভাবে সঠিক উত্তর দিতে হয়। যদি তোমাকে আইডিনের কেলাস দেখিয়ে ঘুরিয়ে **প্রশ্ন** করা হয়: 'বল তো এর সবচেয়ে ক্ষুদ্রকণাটি কি?' এবার তুমি নিশ্চয়ই উত্তর দেবে: 'আইডিনের দুটি পরমাণু মিলে এক-একটি জোড়।'

কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর তুমি যদি শুধু সঠিকভাবে না — বিজ্ঞানসম্মতভাবে দিতে চাও — কেলাসিত আইডিন হাতে নিয়ে বলবে: 'এই পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রকণা অণু — আইডিনের দুটি পরমাণু থেকে যা তৈরি।'

তাহলে দেখ, শেষ পর্যন্ত আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়ালাম তা হল — পদার্থের অণু একই ধরনের দুটি পরমাণু থেকে তৈরি হতে পারে। শুধু যে আইডিনের অণু পারে তা না — দুই-পরমাণুর ওরকম অণু আছে অসংখ্য। তারা তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই তখন, যখন তুমি এই বইটা পড়ছ, একই ধরনের দুটি পরমাণুর মিলনে তৈরি অণু তোমার চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে; এমনকি তোমার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করছে।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বাতাসে যেসব অণু ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের কথাই বলছি। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে — অক্সিজেন, নাইট্রোজেন অণুর কথা বলছি, প্রধানত যা দিয়ে তৈরি বাতাস।

যখন আমরা বলি: 'অক্সিজেন আমরা নিশ্বাস নিই,' তার মানে হল এই যে, দু'পরমাণুর অক্সিজেন অণু আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে নিই। রোগীদের কষ্ট হলে অক্সিজেন দেওয়া হয়; যা এই ধরনের অণুকণা। তা কম্প্রেস করে ইস্পাতে তৈরি সিলিণ্ডারে ঢুকিয়ে রাখা হয়। মহাকাশচারীদের রকেটের জন্য যে তরল অক্সিজেন লাগে তাও দুই পরমাণুর অক্সিজেন অণু। এখন এত জোর দিয়ে এসব কথা বলছি কেন, দুই পরমাণুর অণু বলতে কী বোঝায়? সত্যি সত্যিই কি অন্য কোন অণু আছে? আছে।

যখন বজ্র বিদ্যুৎ নিয়ে ঝড় ওঠে তখন বাতাসে যে অণু তৈরি হয় তা অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু থেকে তৈরি। অক্সিজেন 'ওজনে রূপান্তরিত হয়'। তাহলে তিন পরমাণু যুক্ত অণু থেকে যে গ্যাস তৈরি হয় তার সঙ্গে দুই পরমাণুর অক্সিজেন অণুর এত পাথক্য যে তিন পরমাণু যুক্ত অণুর অন্য নাম দিতে হয়েছে: ওজন।

অক্সিজেনের কোন গন্ধ নেই কিন্তু ওজনের গন্ধ আছে এবং বেশ কটু গন্ধ ('ওজন'-এর গ্রীক অর্থ হল 'গন্ধবাহী')।

অক্সিজেনের কোন রঙ নেই, চোখে দেখা যায় না। ওজন নীলরঙের গ্যাস; চোখে দেখা যায়।

আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিই; ওজনে নিশ্বাস নেওয়া নিষেধ। তবে এও সত্যি, বাতাসে কিছুটা ওজন থাকলে বাতাস তাজা হয়। কিন্তু ওজনের পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায় — তাহলে তা বিষাক্ত।

অক্সিজেনের চেয়ে ওজন দেড়গুণ ভারী।

তরল অক্সিজেনের রঙ শুভ্রনীল; তরল ওজন — কালো-বেগুনি রঙের। তাছাড়া দুটি তরল পদার্থ ভিন্ন তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়।

একথা বিশ্বাস করা যায় না এই দুটি পদার্থের 'মিশ্রণ' একই ধরনের পরমাণু থেকে তৈরি হয়েছে। বিশ্বাস না করলেই বা কি হবে — কথাটা তো সত্যি।
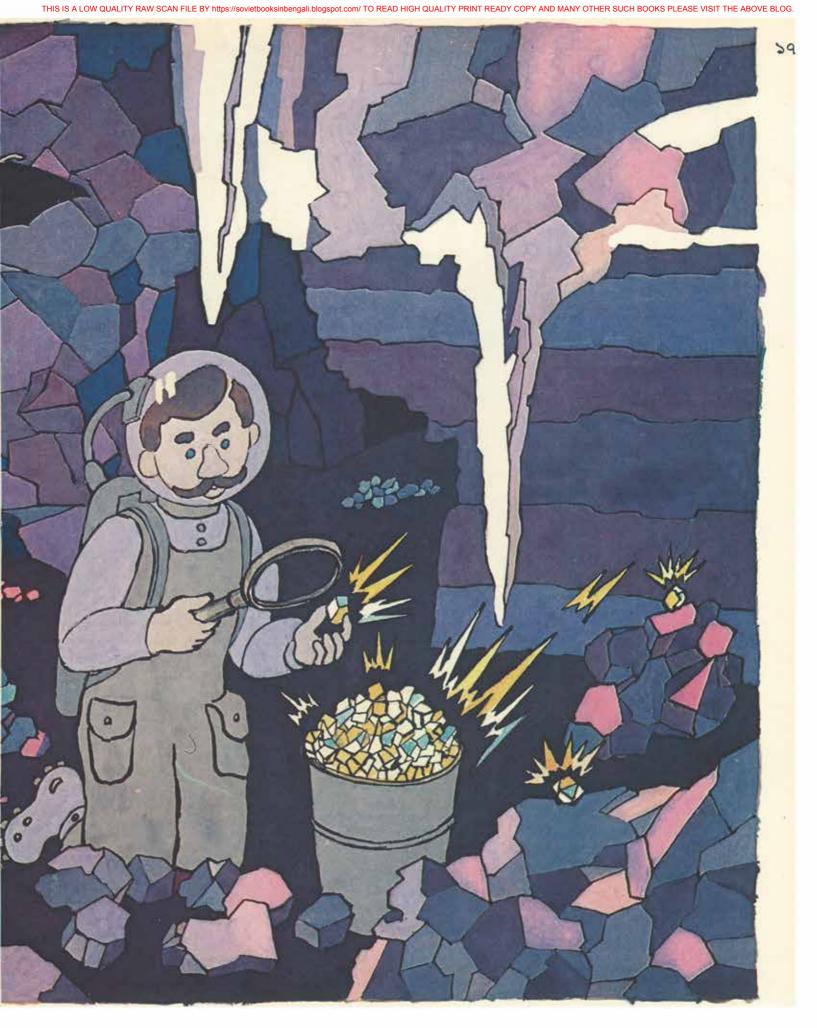
বিভিন্ন ধরনের পরমাণু কীভাবে মিলিত হয়

তাহলে দেখ, একই ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুদের মধ্যে যদি এত রকম পার্থক্য থাকে, তাহলে বিভিন্ন ধরনের পরমাণু থেকে তৈরি অণুর মধ্যে কি রকম পার্থক্য থাকতে পারে! ভালো কথা, বাতাসের মধ্যে খোঁজ নেওয়া যাক। যে ধরনের অণু খুঁজছি তা হয়ত বাতাসের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। নিশ্চয় খুঁজে পাবই।

তুমি কি জানো, নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের মধ্যে কী ধরনের অণু তুমি ছেড়ে দাও? (তুমি শুধু না, আমরা সবাই, জীবজন্তু পশুপাখি।) কার্বনিক গ্যাসের অণুর কথা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে।

যখন তুমি সোডাওয়াটার বা লেমোনেড খাও, কার্বনিক গ্যাসের বুদ্বুদ জিবে বেশ আরাম দেয়। ছোট ছোট টুকরো যে শুকনো বরফকুচি আইসক্রিমবাক্সের মধ্যে রাখা হয় — তাও এই ধরনের অণু থেকে তৈরি। বলতে কি শুকনো বরফ তো কঠিন কার্বন-ডাইঅক্সাইড।

অক্সিজেনের দুটি পরমাণু কার্বনিক গ্যাসের অণুর মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে কার্বনের একটি অণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। 'কার্বন' হল 'সেই বস্তু — যার থেকে কয়লার জন্ম'। কার্বন শুধু যে কয়লার জন্ম দেয় তা কিন্তু না। যখন তুমি কোন পেন্সিলে লেখ কাগজের ওপর কৃষ্ণসীসের আঁশ থেকে যায়। এটাও কার্বনের পরমাণু থেকে তৈরি। কার্বনের পরমাণু থেকেই তৈরি হীরা ও সাধারণ ভূষাকালি। তাহলে দেখ একই পরমাণু অথচ তা থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হচ্ছে।

শুধু নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত না হয়ে যখন কার্বনের পরমাণু 'অন্যান্য' পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এত অসংখ্য জিনিসের জন্ম দেয় যে তা গুণে শেষ করা কঠিন। এই বিশ্বের সবচেয়ে হালকা গ্যাস হাইড্রোজেনের পরমাণুর সঙ্গে কার্বনের পরমাণু যখন যুক্ত হয়,
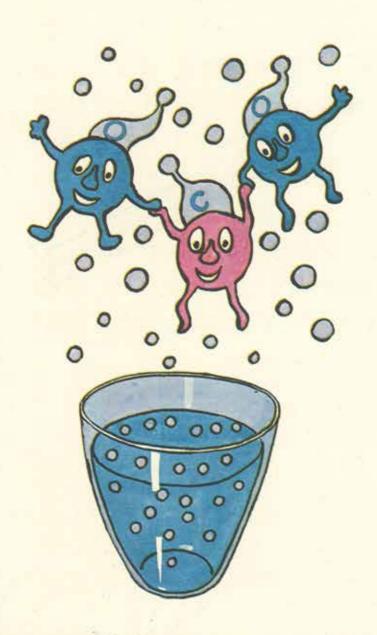
বিশেষভাবে তখন অনেক জিনিসের জন্ম হয়। এইসব জিনিসের সাধারণত একরকম নাম হয় — হাইড্রোকার্বন। কিন্তু প্রতিটি হাইড্রোকার্বনের আবার আলাদা আলাদা নাম আছে।

হাইড্রোকার্বন থেকে সহজে যে গ্যাস আমরা পাই, যা রান্নাঘরে জ্বলে — তা হল মিথেন। কার্বনের একটি পরমাণু ও হাইড্রোজেনের চারটি পরমাণু মিথেনের অণুতে আছে। রান্নাঘরের আগুনে মিথেনের অণু যখন পুড়তে থাকে, কার্বনের পরমাণু অক্সিজেনের দুটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। তার ফলে কার্বনিক গ্যাসের অণু পাওয়া যায় যা ইতিমধ্যেই তোমার বেশ পরিচিত গ্যাস। এছাড়া হাইড্রোজেনের পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের পরমাণু

যুক্ত হয়ে যে অণু তৈরি করে তা এই পৃথিবীর যে কোন বস্তু বা প্রাণীর পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

বাতাসেও এইসব জিনিসের অণু আছে; পরিপূর্ণভাবেই আছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, যেভাবেই হোক এ ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। কারণ নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে যেসব অণু ছাড়ো তার মধ্যে কার্বনিক গ্যাসের অণুর সঙ্গে এসব অণুও আছে।

এ জিনিসগুলি আবার কী?

অনুমান করতে না যদি পারো, ঠাণ্ডা কাচের ওপর নিশ্বাস ফেলে দেখো — দেখবে কাচের ওপরে জলকণা।

অণু কীভাবে যুক্ত ও বিযুক্ত হয়
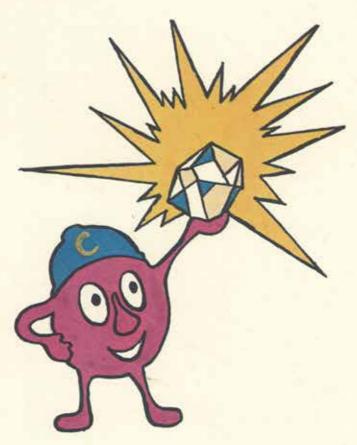
বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখার মত, জলের একটি গুণ তুমি নিশ্চয়ই শীতের নদীতে, হ্রদে বা পুকুরে বহুবার পর্যবেক্ষণ করে দেখেছ।

তুমি দেখেছ, সেখানে বরফ থাকা সত্ত্বেও কঠিনজল বরফের নিচে আছে তরলজল আর বরফের ওপরে জলীয়বাষ্প (যা সবসময় বাতাসে আছে)। এখানে কোন ব্যাপারটি অদ্ভুত? তা হল এই, পৃথিবীতে জল-ই একমাত্র বস্তু — যা প্রাকৃতিক অবস্থায় একই সময়ে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় রূপে থাকতে পারে।

পদার্থের এই তিনটি অবস্থা কী জিনিস? কী ব্যাপারে এদের মধ্যে মিল আছে, কী ব্যাপারে মিল নেই?

প্রথমে পদার্থের কঠিন অবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যাক। একথা নিশ্চয়ই জানো যে, কোন কঠিন জিনিস ভাঙতে হলে বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন আছে। এবং প্রায়ই সেটা কম নয়। এ থেকে প্রথম সিদ্ধান্ত: যেসব অণু থেকে কঠিন পদার্থটি তৈরি তারা একে
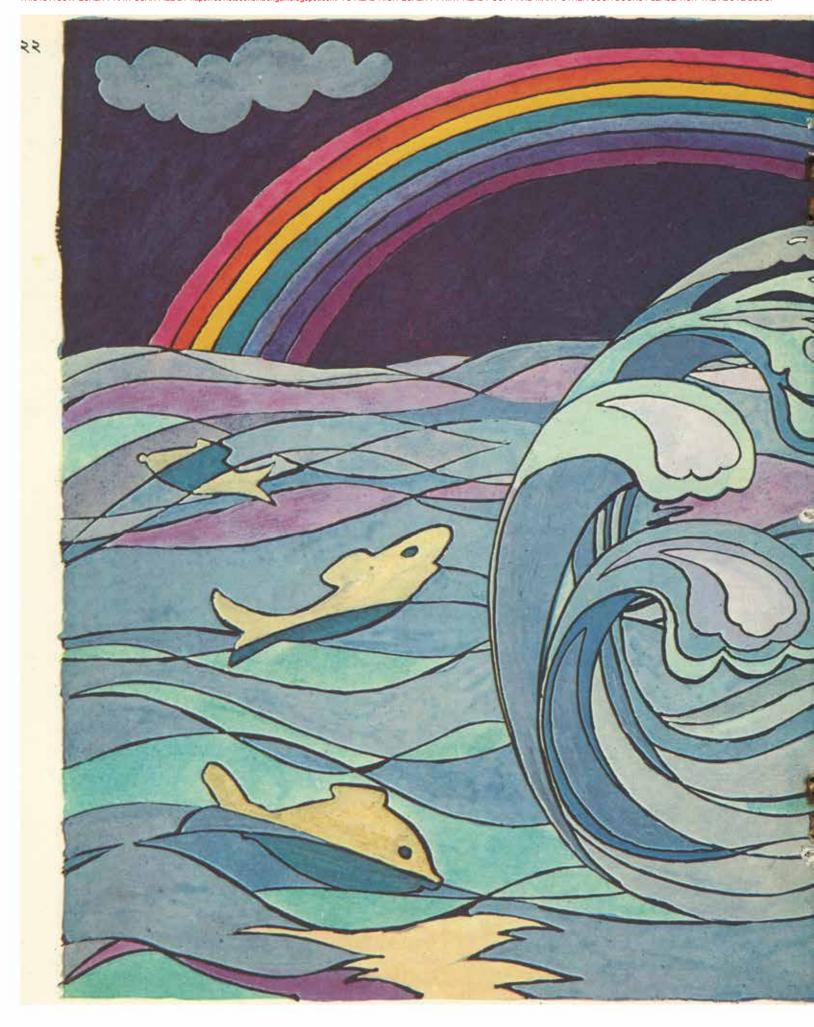
অন্যের সঙ্গে পাকাপাকি যুক্ত। তা না হলে, যেসব জিনিসকে আমরা কঠিন বলে ভাবি তা অনেক আগেই খসে খসে পড়ত।

এও তুমি জানো যে, শক্ত কোন প্লেটকে ভেঙে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত প্লেট যেমন সে তার আকারে থাকে। ব্লক ব্লকই, পাইপ পাইপই, গোলক গোলাকারই থাকে। সহজ কথায় কোন কঠিন বস্তু তার নিজের আকারে থাকে। আর এই যখন ব্যাপার, তুমি দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্ত নিতে পার তা হল, কঠিন বস্তুতে অণুরা দৃঢ়ভাবে সুবিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি অণু তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে যেমন সৈন্যেরা নিজের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে (যতক্ষণ সৈন্যেরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তারাও নির্দিষ্ট আকারে দাঁড়িয়ে থাকে)।

কঠিন পদার্থের আরেকটি গুণের কথা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে: কঠিন পদার্থকে চাপ দিয়ে দাবা কঠিন। এর থেকে কী বোঝা যায়? কঠিন পদার্থে অণুরা পরস্পরের গায়ে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে — সূর্যমুখীফুলের বীচিরা যেমন সূর্যমুখী ফুলের ভেতরে।

সেই বীচিগুলোকেই গেলাসে রাখলে তাকেও তুলনা করা যেতে পারে তরল পদার্থের অণুর সঙ্গে। তবে তরলের ক্ষেত্রে, কঠিন পদার্থের মত অত দৃঢ়বন্ধনে বিন্যস্ত নেই; যদিও তারা পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে থাকে। যার ফলে তরলের ওপর চাপ দেওয়াও বেশ কঠিন। (এ ব্যাপারে তুমি একটা পিচকারীতে জল ভরে তার মুখ বন্ধ করে পিস্টনে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দেখতে পারো।) তাহলে দেখা যাচ্ছে, তরল অবস্থাতেও অণুরা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে।

সত্যিই কি তাই ঘটে? তোমার মনে হতে পারে কত ঘনিষ্ঠভাবে ওরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যখন কোন তরল পদার্থ চলকে ওঠার থেকে তুমি যে ক্ষুদ্র জলকণা পাও, — জানো কি তার মধ্যে কত অসংখ্য অণু আছে? শুনলে ভয় পেয়ে যাবে, কোটি কোটি! তরল পদার্থের অণুরা পরস্পরকে জোরালো ভাবে ধরে রাখে, যার থেকে কোন অণুর আলাদাভাবে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। যদি ওরা ওভাবে একে অন্যকে ধরে না রাখত, তরলের প্রবাহের ফোঁটা থেকে বিন্দু বিন্দু জলকণা তৈরি হত না। আলাদা আলাদা অণু হয়ে তারা বেরিয়ে আসত।

তাহলে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, কিছু কিছু ব্যাপারে কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে মিল আছে। কঠিন ও তরলের অণুরা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধনে যুক্ত; একে অন্যের গায়ে লেগে আছে: প্রতিবেশী অণু প্রতিবেশী অণুর 'হাত দৃঢ়ভাবে ধরে আছে'।

আবার ওদের মধ্যে লক্ষ্য করার মত পার্থক্যও আছে: কঠিন পদার্থের অণুদের মত তরল পদার্থের অণুরা সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত না। তরল পদার্থ নিজের আকারে থাকতে পারে না। সহজ কথায় — তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়।

এবার তরলের সঙ্গে গ্যাসের তুলনা করে দেখা যাক। কখনো যদি সাইকেলের টায়ার পাম্প করে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছ — তরলের থেকে আলাদা করে বাতাসে চাপ দেবার মত কিছু নেই। এক লিটার বাতাসে চাপ দিয়ে এক আঙ্গুঠি পরিমাণ ঘনত্বে কমিয়ে আনা যেতে পারে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, এ ব্যাপারটা সম্ভব হওয়ার কারণ বাতাসের অণুদের মধ্যে বেশি করে ফাঁক থাকে। তোমার ঘরের বাতাসে প্রতিবেশী দুটি অণুর মধ্যে যে ফাঁক থাকে তা অণুদের নিজেদের মাপের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি।

তরল ও গ্যাসের আরেকটি গুণের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। ধরো এক প্যাকেট দুধ

তুমি কিনেছ, যার আয়তন আধ লিটার। যেকোন পাত্রে ঢাললেও তা আধ লিটার থাকবে।

কিন্তু গ্যাসের বেলা কী ঘটে? কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে গ্যাস থাকতে পারে না। প্রায় সর্বত্রই গ্যাসের অণু ভেসে বেড়ায় — যদি না তাকে কোন পাত্র বা ঘরের দেয়াল বাধা দেয়। মহাকাশে যদি গ্যাসভর্তি বেলুনের মুখ খুলে দেওয়া হয় — গ্যাসের অণু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

এর থেকে তুমি নিশ্চয়ই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারলে: কোন কিছুই গ্যাসের অণুদের — একে অন্যকে — ধরে রাখতে পারে না।
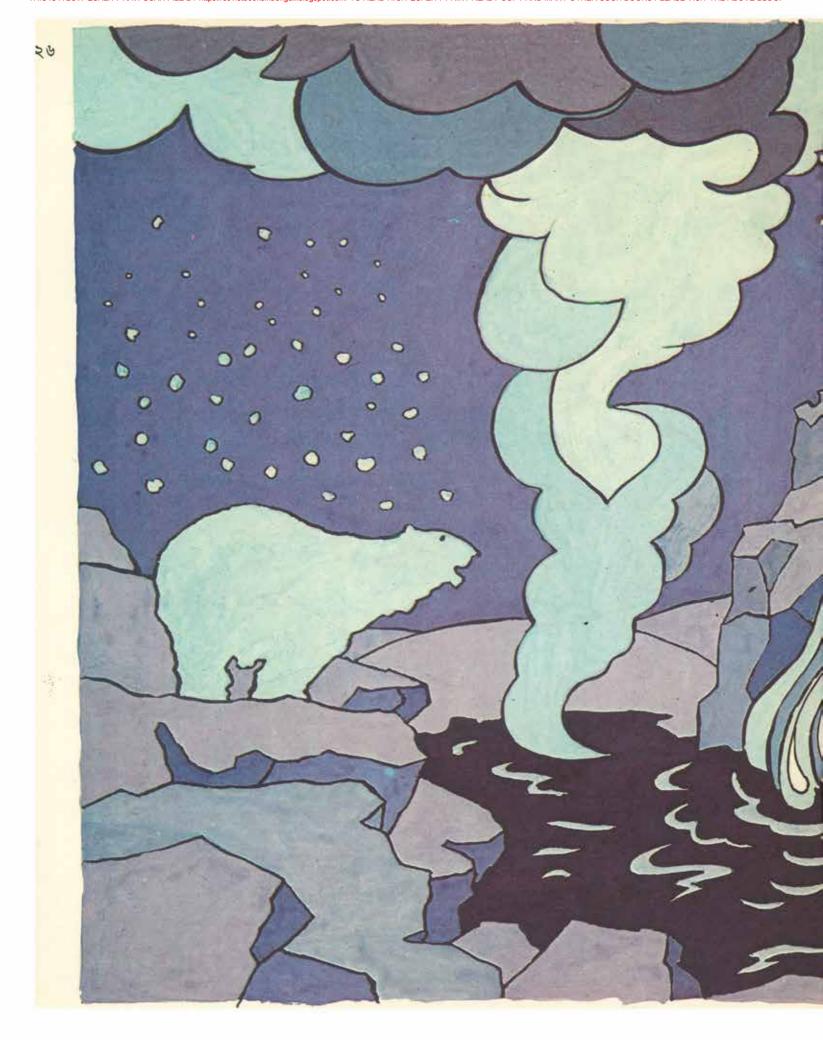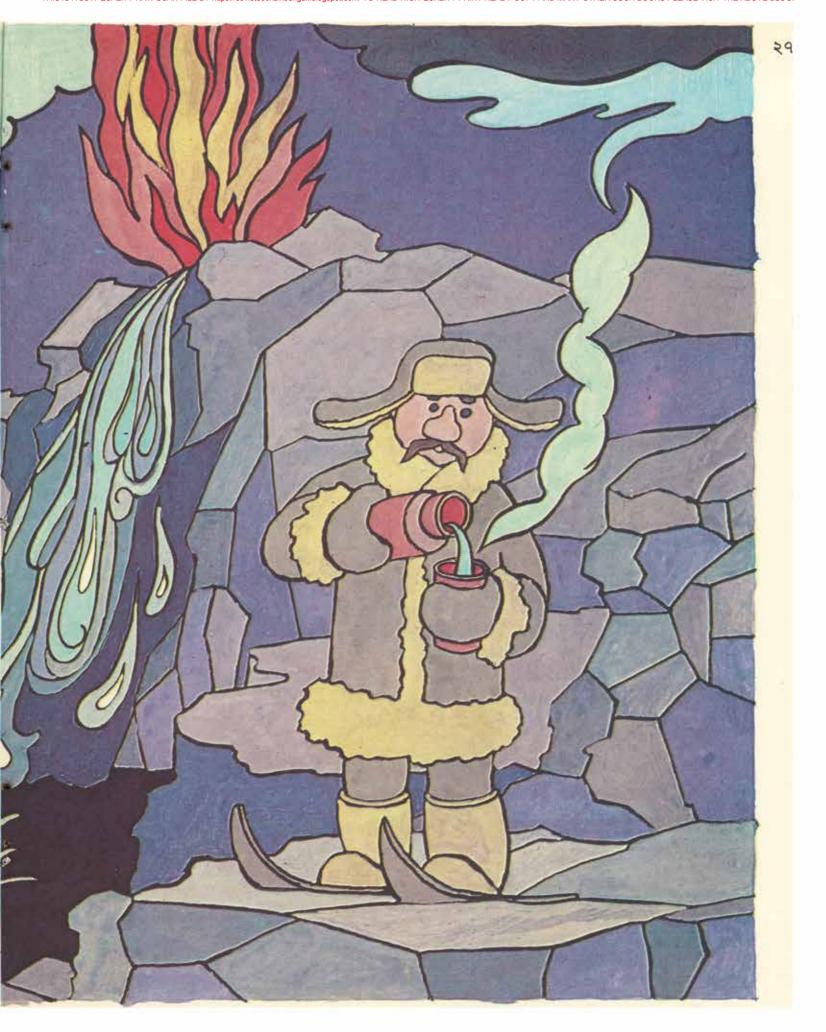
এর থেকে কী জানা গেল: কঠিন ও তরল পদার্থের বেলা প্রতিবেশী অণুরা একে অন্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে সুবিন্যস্ত আছে আর গ্যাসের অণুদের মধ্যে কোন বন্ধন নেই, তারা পরস্পর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং, যে-শক্তি পরস্পরের হাত জোরালোভাবে ধরে রাখার ব্যাপারে অণুদের সাহায্য করে (পদার্থ বিদ্যায় যার নাম দেওয়া হয়েছে আণবিক আকর্ষক শক্তি), তার প্রভাব কেবল অল্প দূর পর্যন্ত।

তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, মসৃণ দেয়ালে কীভাবে টিকটিকি ছুটে বেড়ায়, এমনকি

সিলিং-এ, তবু কেন আছড়ে পড়ে না? কী টিকটিকিকে ধরে রাখে? টিকটিকির আঙুলের নিচটা বুরুশের মত — যার মধ্যে আছে কোটি কোটি আণুবীক্ষণিক আঁশ, অতি মসৃণ দেয়ালেও যে অসংখ্য অমসৃণতা থাকে, তাতে তা সেঁধতে পারে। এক্ষেত্রে, আঁশগুলির অণু দেয়ালের অণুর এত কাছে আসে যে তাদের মধ্যে আণবিক আকর্ষক শক্তির প্রভাব কাজ করে। তাহলে দেখ, দেয়াল বা সিলিঙে টিকটিকিকে কোন আঠালো জিনিস ধরে রাখে না, যা অনেকেই ভেবে থাকে। আণবিক আকর্ষক শক্তি-ই তাকে ধরে রাখে।

তাই বলে কি গ্যাসের অণু কখনো পরস্পরের কাছাকাছি আসে না? আসবে না আবার! তারা তো একে অন্যের দিকে ভেসে যায়। দৃষ্টান্ত হিশেবে নিজের ঘরটার কথা ভেবে দেখ — হিশেব করলে দেখবে — কম নয় সেকেণ্ডে চারশ কোটি বার অণুগুলির ঠোকাঠুকি হচ্ছে!

কিন্তু এত সংখ্যক সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্রে বাতাসের অণুরা তো শেষপর্যন্ত একে অন্যের কাছাকাছি এসে 'পরস্পরের হাত ধরতে বাধ্য' এবং তা অতিক্ষুদ্র কেলাসে মিলিত হতে পারে। কেন এটা ঘটে না? মেঘ, জল, কুয়াশার অণুর কথা ধরা যেতে পারে — ওরা কেন বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে আসে না? কেন আমাদের গ্রহে তরল অক্সিজেনের কোন নদী নেই? সকালবেলা নাইট্রোজেনের শিশির দেখা যায় না? যা কিনা কঠিন কার্বনিক-ডাইঅক্সাইড সেই 'শুকনো বরফ' থেকে তুষারকণার হিমনদী কেন বেরিয়ে আসে না? এইসব অণুদের পরস্পরের কাছে আসার ব্যাপারে কে বাধা দেয়?

বাধা দেয় গতিবেগ। সেজন্যে তোমার ঘরের মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণু প্রতি সেকেন্ডে আধ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে। মানে প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০ কিলোমিটার বেগে: শব্দের চেয়ে দেড়গুণ দ্রুতবেগে! (মনে রেখ, এ কেবলমাত্র মাঝারি ধরনের গতিবেগ: এমন অণুও আছে যা এই গতিবেগের চেয়ে ধীরে বা দ্রুত ছোটে।)

প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায় অণুরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় — বিলিয়ার্ড বোর্ডের গুটির মত।

এবার তাহলে তুমি বুঝেছ, গ্যাসের অণুরা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে: ওদের গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া দরকার। কীভাবে? গ্যাসকে শীতল করা যায়। কারণ তাপমাত্রা যত বাড়ে অণুরা তত বেশি গতিবেগে ছোটে। আর তাপমাত্রা কমিয়ে দিলে এর ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটে — অণুদের গতিবেগ কমে আসে। অর্থাৎ কোন গ্যাসকে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শীতল করলে তা তরলে রূপান্তরিত হয়, এমনকি কঠিন পদার্থে।

বলা ভালো, যদিও উষ্ণতা কমে আসে তবু তখনো অণুগুলির গতিবেগের মধ্যে উষ্ণতা থাকে: ছোটার বেগ কখনো একেবারে থেমে যায় না। তবে এও ঠিক, কঠিন ও তরল পদার্থের অণুরা গ্যাসের মত ভেসে বেড়ায় না। কঠিন পদার্থে নিজের জায়গা থেকে না সরে তারা 'নাচে'। আর তরল অবস্থায় অণু নৃত্যরত অবস্থায় থাকে: একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে করতে — লাফিয়ে ওঠে। তারপর দ্বিতীয় জায়গায় নৃত্যরত থাকে: তারপর তৃতীয় জায়গায়, আর এভাবেই পরপর স্থান বদলে বদলে...

বেশি শক্তি ধরে এমন অণুরা এতদূর লাফিয়ে ওঠে যে, ওপরে ওঠার ফলে দেখা গেল প্রতিবেশী অণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে গেল। তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হল। আর যদি বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত গরম করা হয় যেসব অণু ওপরে আছে তারা শুধু বাষ্পে পরিণত হবে না — তরলের অভ্যন্তরে যেসব অণু আছে তারাও বাষ্পে (বলা যেতে পারে 'গ্যাসে') পরিণত হয়।

জলের অণু কীভাবে নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়

চমৎকারভাবে! শূন্যের নিচে ১৮৩ ডিগ্রী তাপমাত্রায় অক্সিজেনের অণু তরলে রূপান্তরিত হয়; আর শূন্যের নিচে ১৯৬ ডিগ্রী তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের অণু তরলে রূপান্তরিত হয়। অথচ জলের বাষ্পের অণু শূন্যের ওপরে ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় তরলে রূপান্তরিত হয়। শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায়, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণু যখন তরলে রূপান্তরিত হওয়া থেকে অনেক দূরে তার অনেক আগেই জল কঠিন পদার্থ বরফে রূপান্তরিত হয়।

কেন এরকম ঘটে? তবে কি এরকম কোন ব্যাপার হতে পারে যে, বাতাসে তার অন্যান্য প্রতিবেশী — অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনিক গ্যাসের অণুর চেয়ে জলের অণু ভেসে বেড়ায় অনেক মন্থর গতিতে? এক্ষেত্রে ঘটছে এর উল্টো। জলের অণু মন্থর গতিতে ভেসে বেড়ায় না, বেশ দ্রুত বেগেই ভেসে বেড়ায়। কারণ তারা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণুর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কম হালকা। কার্বনিক গ্যাসের অণুর কথা তো ধরছিই না। এর থেকে কি মনে হচ্ছে না — ইতিমধ্যেই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনিক গ্যাসের অণু প্রকৃতির মধ্যে যখন গ্যাস আকারে থাকছে — পৃথিবীতে জল কি তাহলে গ্যাস আকারে থাকত না? কিন্তু আমরা যেভাবে ভাবছি ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না।

যদিও জলের অণুর মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলে, জলের অণুকে কী শক্তি সাহায্য করে যার ফলে জলের অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ফটিক কণায় পরিণত হয়? এই শক্তির কল্যাণে অণুরা সংঘর্ষের কালে বিলিয়ার্ড গুটির মত আচরণ করে না। বরং চোরকাঁটার মতো ছোঁয়ামাত্র পরস্পরের সঙ্গে লেগে যায়। আর লেগে যখন যায়, তখন ছাড়াতে হলে রীতিমতো ঝাঁকুনি দেওয়ার প্রয়োজন...

কী কী এই শক্তি?

জলের অদ্ভুত গুণের জন্য তার অণুতে হাইড্রোজেনের যে দুটি পরমাণু আছে তারাই দায়ী।

পকেট টর্চের ব্যাটারীতে যেমন একদিকে '+' (যুক্ত) ও অন্যদিকে '–' (বিযুক্ত)

চিহ্ন দেওয়া থাকে — হাইড্রোজেনের উভয় অণুতে 'যুক্ত' চিহ্ন দেওয়া থাকলে ভালো হত। আর জলের অণুর বিপরীত দিকে থাকে 'বিযুক্ত' চিহ্ন। দেখা যাচ্ছে, জলের অণুও বৈদ্যুতিক। বিদ্যুতের কণা কী সুন্দরভাবে জোড় বাঁধে তা তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে পার: প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে শুকনো চুল আঁচড়ে একটুকরো ছেঁড়া কাগজের সামনে ধর, দেখবে তা কত তাড়াতাড়ি জুড়ে যাচ্ছে।

সাধারণ অণুরা যে শক্তিতে পরস্পরকে ধরে থাকে, জলের অণুদের মিলিত হতে সাহায্য করে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো।

যদি এই বৈদ্যুতিক শক্তি না থাকত — বরফ, নদী বা সমুদ্র বলে কিছু থাকত না — সর্বত্রই জল গ্যাস হয়ে থাকত।
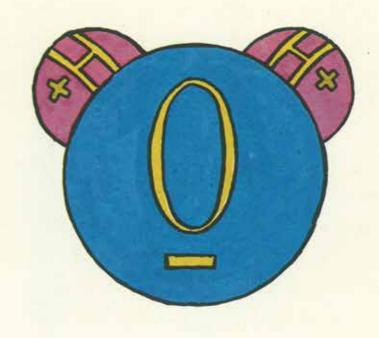
জলের অণু কীভাবে অন্য অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়

ড্রপারে একফোঁটা জল ভরে যদি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে — জলের উপরিভাগ সমতল না — নলের গা বরাবর জল মধ্যভাগের চেয়ে অনেক বেশি ওপরে উঠেছে (কাচের বয়ামে বা যেকোন কাচের পাত্রেও জল গা বরাবর ওপরে ওঠে, কিন্তু
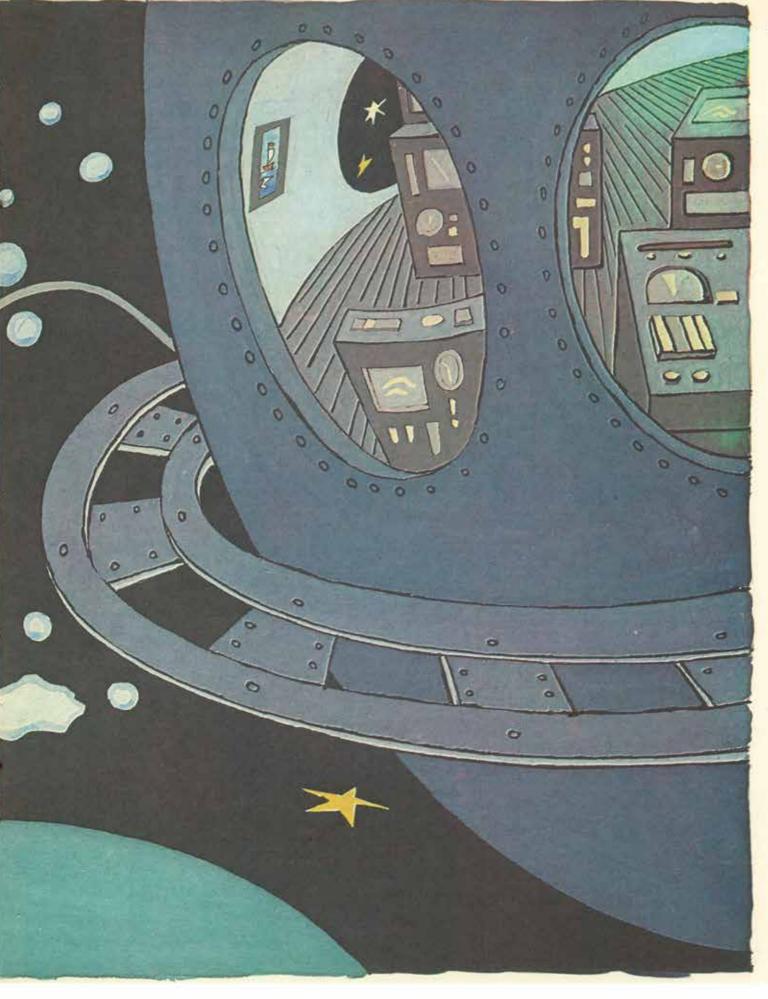
সরু নলে পরিষ্কারভাবে তা দেখা যায়।) কী বস্তু জলকে ওপরে উঠতে বাধ্য করে?

নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ: যদিও জলের অণুরা পরস্পরকে প্রচণ্ড শক্তিতে ধরে থাকে তা সত্ত্বেও কাচের পাত্রটির দেয়ালের গায়ে তারা আরো জোরালোভাবে যুক্ত হয়। যার ফলে কাচ জলে ভিজে ওঠে।

তাহলে কেন জল কাচের গা বেয়ে আরো ওপরে ওঠে না? যদিও তা সাবলীলভাবে উঠে যেতে পারে কিন্তু তার ওজন উঠতে দেয় না। ওজন অণুদের টানে নিচের দিকে আর জলের অণুরা কাচের উপরিভাগে কাচের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়।

জলে ভেজে পৃথিবীতে এরকম জিনিসের সংখ্যা কম না। কাচ ছাড়াও — চীনেমাটির বাসন, বিভিন্ন ধাতু, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ — বিশেষভাবে খড়িমাটি ও জিপসাম জলে ভেজে...

এরকম কোন জিনিস আছে কি — যাদের সঙ্গে দুর্বলভাবে বা নিজেদের মধ্যে জলের অণুরা যেভাবে যুক্ত হয় তার চেয়ে ক্ষীণ ভাবে মেলে? আছে, অনেক আছে। যেমন — গন্ধক, গ্রাফাইট, মোম, প্যারাফিন, নাফথালিন, পলিথিন, যেকোন পশুর চর্বি। এরা জলে ভেজে না।

এবার তাহলে কল্পনা করে দেখা যাক। মহাকাশযানের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক তৈরির ভার তোমাকে দেওয়া হল। ট্যাঙ্ক তৈরির জন্য কী ধরনের উপাদান তুমি বেছে নেবে? জলে যা ভেজে তা নেবে — না, জলে যা ভেজে না তা নেবে?

মহাকাশযানে ওজনের কোন ক্ষমতা নেই। যার ফলে জল ঝরে পড়ে না। আর আণবিক আকর্ষক শক্তি? তারা আগের মতই কাজ করতে থাকে; কোন কিছু ঘটে না। আমি না বললেও তুমি নিজেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ — মহাকাশে অণুদের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে যদি কোন শক্তি কাজ না করত মহাকাশে রকেট পাঠানো আর সম্ভব হত না। কারণ যা কিছু মহাকাশে পাঠানো হত তা ভেঙে চুরমার হয়ে ঝরে পড়ত...

ধরা যাক তুমি এমন উপাদানে ট্যাঙ্কটা তৈরি করলে যে, যাদের সঙ্গে জলের অণু যুক্ত হয় নিজেদের মধ্যে চেয়ে আরো ভালোভাবে। ধরা যাক, কাচ দিয়ে ট্যাঙ্কটা তৈরি করলে। কী ঘটবে? জল ট্যাঙ্কের ভেতরটা নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত ভিজিয়ে ট্যাঙ্কের ভেতরে সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারবে শুধু তা-ই নয়। যদি কল খোলা থাকে কিছু জল বেরিয়ে আসবে; ট্যাঙ্কের গা বেয়ে ওপরে উঠবে। ফলে ট্যাঙ্কের সমস্ত বাইরেটা জলে ঢাকা পড়বে। জল আর ট্যাঙ্কের ভেতরে থাকবে না, বরং জলের ভেতরে থাকবে ট্যাঙ্ক!
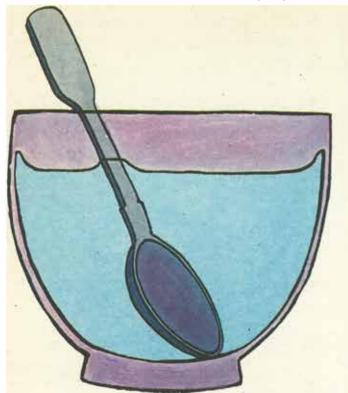
জলে ভেজে না এরকম কোন উপাদানে ট্যাঙ্কটা তৈরি হলে কী ঘটবে? ট্যাঙ্ক যদি পলিথিন থেকে তৈরি হয় (অবশ্য কলটাও একই উপাদানের) — তাহলে?

এখন জল আর নিজে থেকে ট্যাঙ্কের বাইরে কোথাও গড়িয়ে পড়তে পারবে না। সম্পূর্ণভাবে কল খুলে দিলেও একফোঁটা জল বেরিয়ে আসবে না। পৃথিবীতে আমরা দেখি কল খুলে দিলে জল পড়ে, জলের ওজনের চাপে তা নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জলের কোন ওজন নেই; ফলে জল নিচে নামতে পারে না।

এরকম হওয়া সত্ত্বেও কি ট্যাঙ্ক থেকে জল পাওয়া যেতে পারে? যেতে পারে। পিস্টনের সাহায্যে ট্যাঙ্ক থেকে জল টেনে বের করে আনা যায়। কিংবা যদি কোন নমনীয় বা স্থিতিস্থাপক উপাদানে ট্যাঙ্কটা তৈরি করা যায় — তা থেকে নিংড়ে জল বের করে নেওয়া যায়; যেভাবে টিউব থেকে আমরা দাঁতের পেস্ট বের করে নিই। কলের জায়গায় নমনীয় কোন হোজ পাইপের সঙ্গে সরু কোন নল লাগিয়ে নিলেই হল। মহাকাশচারীর জল খেতে ইচ্ছে করলে, সরু নলটা মুখে পুরে নিংড়ে দিলেই জল সোজা মুখের ভেতরে চলে আসবে।

তাহলে দেখ 'জীবন ধারণের' কত টুকটাক ব্যাপারের সমাধানের উপায় মহাকাশচারীদের জেনে রাখতে হয়। কী রকম অবস্থায় জল ভেজা থাকে, কী রকম অবস্থায় ভেজা থাকে না, তাছাড়া সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন অণুর স্বভাবচরিত্র মহাকাশচারীদের জেনে রাখার প্রয়োজন আছে।
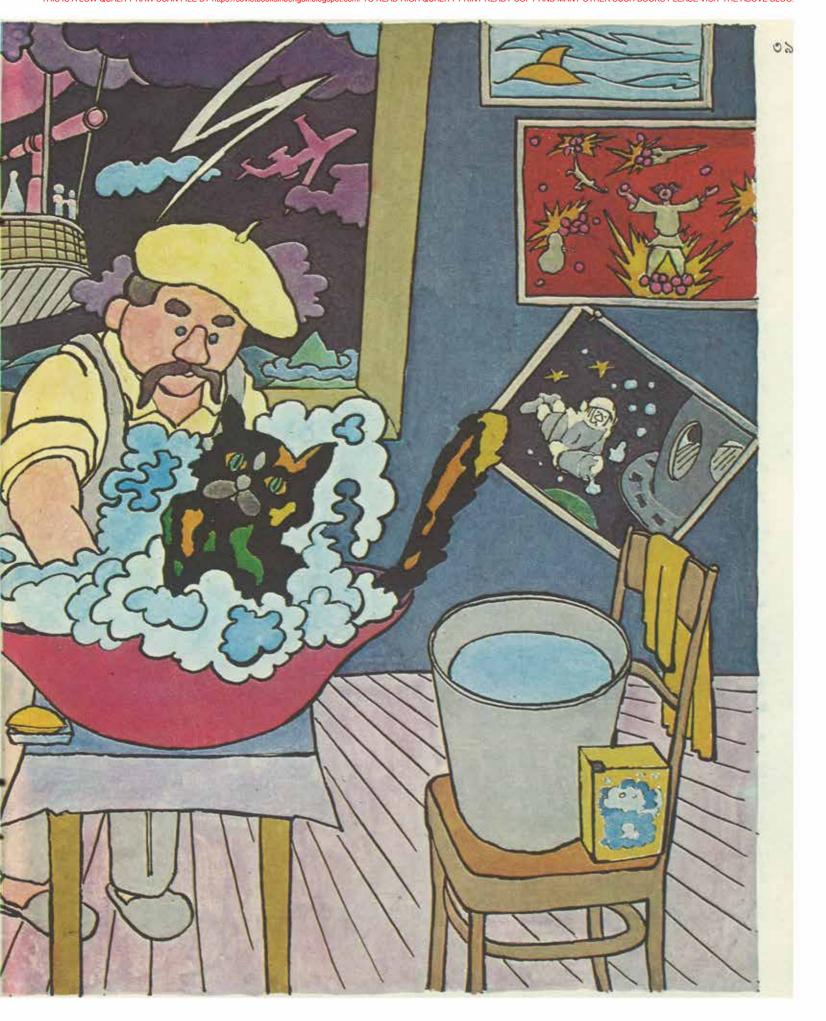
সব জিনিস কীভাবে জলে ভেজানো যেতে পারে

কেন জল একধরনের বস্তুর বেলা ভেজা — অন্যদের বেলা ভেজা না? কেন একধরনের বস্তুর অণুর প্রতি জলের অণুর আকর্ষণ বেশি — অন্যদের বেলা তেমন জোরালো না?

জলে ভেজে যেসব বস্তু আর জলে ভেজে না যেসব বস্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় — এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যখন আগ্রহী হলেন, সমস্ত কিছু দেখেশুনে তাঁরা বললেন, যেসব বস্তু 'জল ভালোবাসে' তাদের অণুর মধ্যেও বিদ্যুৎ আছে। পকেট টর্চের ব্যাটারিতে যেমন '+' ও '–' (যুক্ত ও বিযুক্ত) চিহ্ন আছে এইসব বস্তুর গায়েও সেরকম চিহ্ন এঁকে দেওয়া যেতে পারে। জেলে যেমন জেলেকে দূর থেকে চিনতে পারে জলের অণুও ঐসব বস্তুর প্রতি দূর থেকে টান অনুভব করে।

আর যেসব বস্তুর অণুর মধ্যে বিদ্যুৎ নেই তাদের বেলা কী ঘটে? দেখা যাচ্ছে তাদের বেলাও এই নিয়ম মেনে চলে: তাদের গায়ে নিজের অ-বৈদ্যুতিক অণু ভালোভাবে লাগিয়ে দেয়।

তাহলে যেসব বস্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক অণু নেই, তাদের যদি জলে ভেজানোর দরকার হয় — কী করতে হবে? তারা যাতে জলে ভেজে তেমন কিছু পাওয়া যেতে পারে কি?

পাওয়া যেতে পারে। কীভাবে তা পাওয়া যেতে পারে বলার আগে দক্ষিণের কিছু কিছু দেশে কীভাবে বড় বড় সামুদ্রিক কচ্ছপ ধরে সে কথাই বলব।

সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলা মসৃণ ও পেছল: না যায় ধরা, না জড়িয়ে ধরা। ফলে স্থানীয় লোকেরা দড়িতে বেঁধে একরকম চোষকমাছ কচ্ছপের দিকে ছুঁড়ে দেয় — যাতে সে মাছের কাছাকাছি আসে। মাছেদের শিরদাঁড়াতে চোষক থাকে। সবসময়েই এই মাছগুলি এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়: যে কোন জীবজন্তুকে তাদের আঠালো চোষকে শুষে খেতে

চায়: হাঙর, তিমি, কচ্ছপ... কচ্ছপ এইসব মাছের কাছাকাছি এলে — মাছেরা তার খোলায় আটকে যায়; তখন কচ্ছপকে নৌকোর দিকে টেনে আনা হয়।

ঠিক এরকমই কিছু অণু আছে যারা এই চোষকমাছেদের মতন; যাদের একদিকে বিদ্যুৎ থাকে অন্যদিকে থাকে না। বিদ্যুৎ যেদিকে থাকে জলের অণু সেদিকে প্রবলভাবে ছুটে গিয়ে 'যুক্ত হয়'। আর অ-বৈদ্যুতিক প্রান্তটা জড়িয়ে যায় এমন কোনো অণুর

যাকে কায়দা করা জলের অণুর পক্ষে সহজ নয়। যেমন চর্বির অণু যাকে জল টানতে পারছে না।

ধরা যাক, হাতে তুমি চর্বি মেখেছ। সাধারণ জলে তুমি চর্বি ধুয়ে ফেলতে পারবে না। তুমি আঠালো অণু নিলে। হ্যাঁ, সেসব অণুর কথাই আমি বলছি যারা সাধারণত সাবানে থাকে।

অনেকে মনে করে সাবানের সঙ্গে জল মিশে যে ফেনা তৈরি হয় — তাই সব কিছু পরিষ্কার করে। সাবানের ফেনার বুদ্বুদ ময়লা টেনে নেয়, জলে তা পরিষ্কার হয়। ফেনাটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। এমন সাবানও আছে যা ফেনা দেয় না। (উদাহরণস্বরূপ
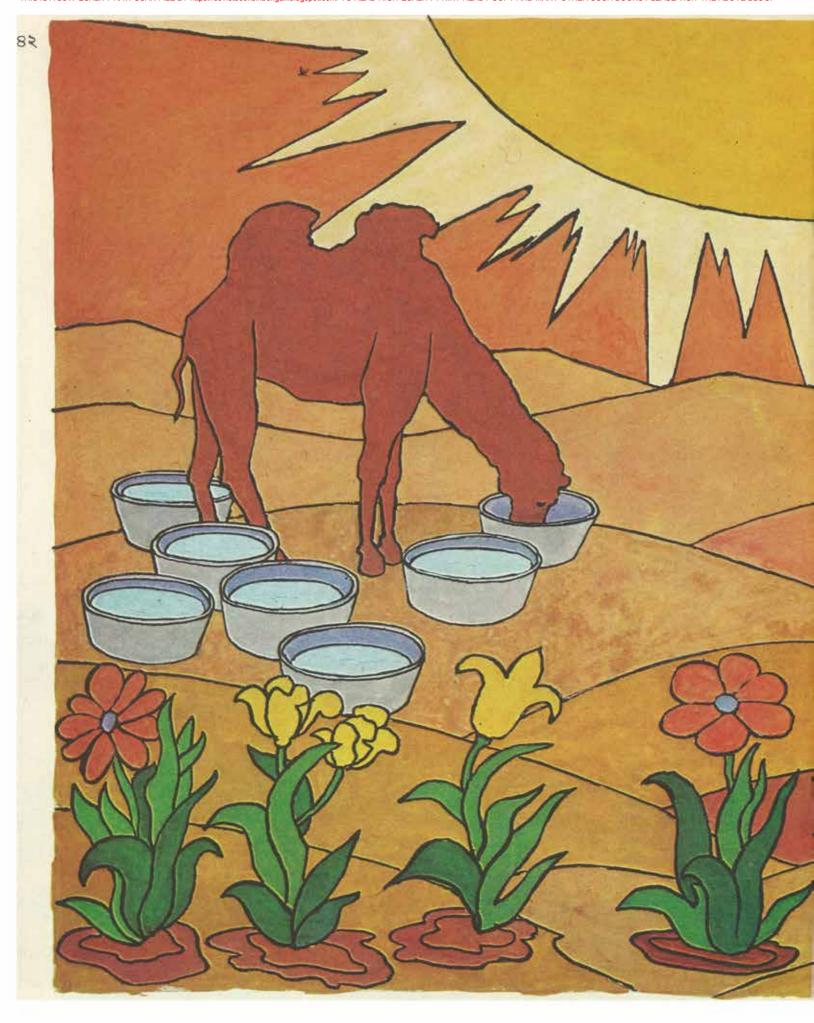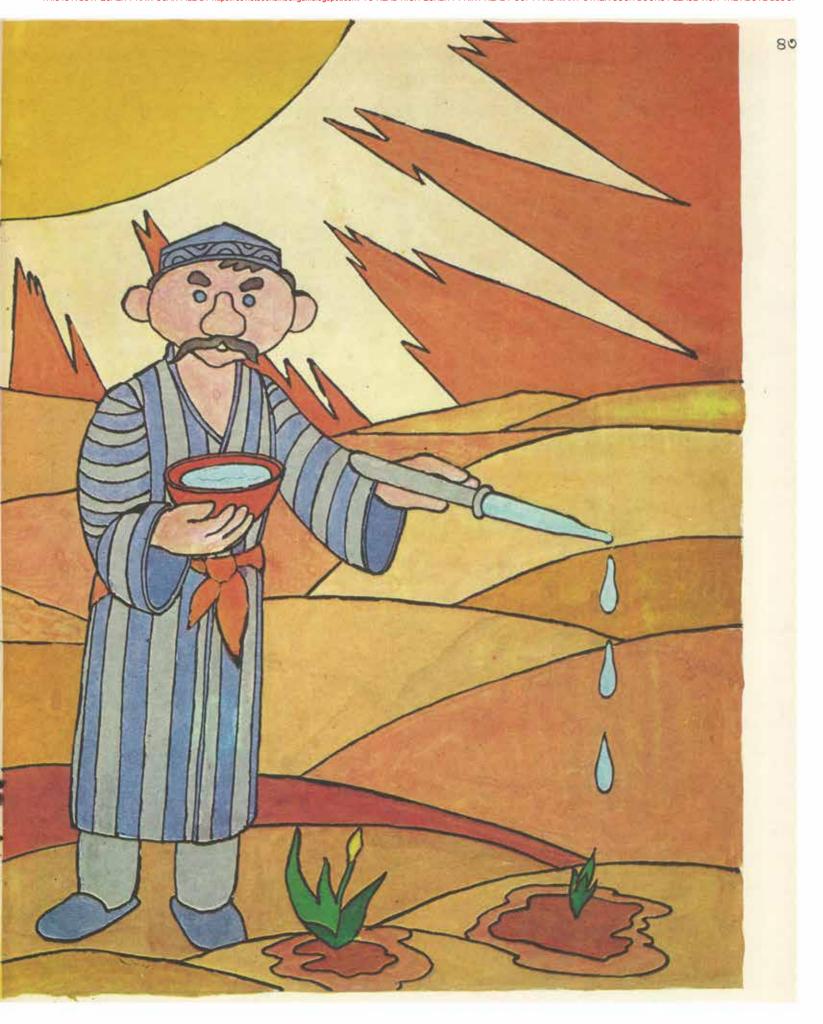
ক্যাস্টর অয়েল সাবানের কথা ধরা যেতে পারে); কিন্তু তা সাধারণ সাবানের মতই পরিষ্কার করে।

এভাবেই, যেসব জিনিস সাধারণত জলে ভেজে না, সাবানের অণু তাদের জলে ভেজায়। অন্যান্য অণুরা কীভাবে জলে কাজ করে?

ড্রপারে একফোঁটা সাধারণ জল ফেলো, পাশেই আরেক ফোঁটা মিষ্টি জল ফেলো, তুমি দেখতে পাবে — জলের ফোঁটা কী রকম আকার নেয় (তবে জেনে রাখা ভালো, ফোঁটা ফেললে তার উপরিভাগটা যেন পরিষ্কার থাকে)।

যদি ওপরটা আদৌ না ভেজে, ফোঁটার আকার হবে গোল — একেবারে ঠিক পাতা বা ঘাসের ওপর শিশির ফোঁটা পড়লে দেখতে যেমন লাগে তেমনি। যদি ওপরের দিকটা ভিজে যায় ঘটবে ঠিক উল্টো ব্যাপার। ফোঁটাটা ধেবড়ে যাবে; হালকা একটা স্তর পড়বে। যদি না ভালো না খারাপ — এ দুইয়ের মাঝামাঝি ভেজে তাহলে জলের ফোঁটা দেখে বলে দেওয়া যাবে ওর মধ্যে কোন জলটা 'বেশি ভেজা'।

শুধু চিনি নিয়ে কেন, এরকম পরীক্ষা তুমি নুন, লেবু জাতীয় অ্যাসিড, সোডা, গ্লিসারিন... বা যে কোন জিনিস নিয়ে করে দেখতে পারো। তাহলে বুঝতে পারবে জলের গুণকে এইসব জিনিস কীভাবে প্রভাবিত করে। অবশ্য তারা যদি জলে দ্রবীভূত হয়।

অণু নেই এরকম জিনিস কীভাবে তৈরি হয়েছে

এ বইয়ের শুরুতে বর্ণমালার বর্ণের সঙ্গে আমি পরমাণুর তুলনা করেছি। তুমি জেনেছ যে শব্দ তৈরির বেলা যেমন বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যুক্ত হয় — অণু তৈরির বেলা তেমনি পরমাণুর সঙ্গে পরমাণু যুক্ত হয়। তুমি এখন অণুর সাহায্যে তৈরি অনেক পদার্থের পরিচয় পেয়েছ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই বিশ্বে এমন অসংখ্য বস্তু আছে যা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি হয়েছে; যাদের কোন অণু নেই।

দৃষ্টান্ত হিশেবে কালো সীসের কথা ধরো। ইতিমধ্যেই বলেছি সীসের আঁশ কার্বনের পরমাণু থেকে তৈরি। তার গঠন দেখতে ঠিক 'জালের' মত।

পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হীরে। হীরেও কার্বনের পরমাণু থেকে তৈরি, যারা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত আছে। সীসের পরমাণুরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'জাল' তৈরি করেছে — হীরের পরমাণুরা তা থেকে অন্য রকমভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'জাফরি' তৈরি করেছে। এই পারমাণবিক 'জাফরিতে'ও কোন অণু দেখতে পাওয়া যায় না।

ধাতু জাতীয় পদার্থের পরমাণুও 'জাফরির' মত দেখতে: ওদের কোন অণু নেই।

এখন আরেকটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যাক। পিরিচে জল ঢেলে তাতে লবণ দ্রবীভূত করো। তারপর অপেক্ষা করো যতক্ষণ না জল শুকিয়ে যায়। পিরিচের ওপর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘনাকৃতি কণা দেখা যাবে। এই কণা লবণের কেলাস।

ওখানেও অণুর নামগন্ধ নেই: পাবে পরমাণুর 'জাফরি'। হীরে ও ধাতুর থেকে এর পার্থক্য হল — নুনের কেলাস নানা ধরনের পরমাণু থেকে তৈরি হয়। যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণু থেকে।

সোডিয়াম রুপোলী ধাতু: হালকা (জলের চেয়ে হালকা)। হলদে-সবুজ রঙের ভারী গ্যাস ক্লোরিন: যার কটু গন্ধ — সাংঘাতিকভাবে বিষাক্ত! সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণু মিলিতভাবে যে কেলাসিত জাফরি তৈরি করে তা থেকে যে জিনিস তৈরি হয় — তার কোন রঙ বা গন্ধ থাকে না। তা দেখতে সোডিয়াম বা ক্লোরিন কারো মতোই না।

আবার এমন পরমাণুও আছে যারা কারো সঙ্গে মিলিত হতে চায় না। নিজেদের মধ্যেও যেমন না 'অন্য' পরমাণুর সঙ্গেও না। অমিশুকে এইসব পরমাণু থেকে যেসব গ্যাস তৈরি হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'একপরমাণু গ্যাস'। কিন্তু ওদের প্রত্যেকের যার যার নিজের নাম আছে। যেমন হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন। এইসব গ্যাস বাতাসে আছে কিন্তু খুবই সামান্য পরিমাণে।

তাহলে দেখ, এই হল আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নানা বৈচিত্র্যের পদার্থে ভরা বিশ্ব।

তুমি যদি চোখে দেখা যায় না এমনই সব পদার্থের গতি সম্পর্কে জানতে চাও, আমাদের চারপাশে প্রতি সেকেণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেসব পদার্থ যদি তাদের সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে আগ্রহী হও — তোমার শিক্ষকদের সাহায্য সবসময়েই পাবে। তাঁরা যেসব বই পড়তে বলবেন, পড়ে দেখো। তোমার সবচেয়ে যা লাভ হবে — আর সবচেয়ে যা চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা করে দ্যাখো। যার ফলে তুমি হঠাৎ কোন নতুন জিনিসের আবিষ্কার করে ফেলতে পারো।

সাফল্য কামনা করি!

М. Константиновский
«ПОЧЕМУ ВОДА МОКРАЯ»
На языке бенгали

M. KONSTANTINOVSKY
WHY IS THE WATER WET
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

ISBN 5-05-000728-5